সম্রাট

◆ ফুটবলের সম্রাট পেলেকে এবার দেখা যাবে প্রচারে। সাবওয়ে রেস্তোরাঁর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন তিনি।

সংবাদ
প্রতিদিন

আশ্রয়

◆ মার্কিন গুপ্তচর সংস্থার প্রাক্তন কর্মী এডওয়ার্ড স্নোডেন অবশেষে একবছরের জন্য আশ্রয় পেলেন রাশিয়ায়।

কলকাতা ◆ ২ আগস্ট ২০১৩ শুক্রবার ১৬ শ্রাবণ ১৪২০ ◆ ৩.৫০ টাকা ◆ বারো পাতা ◆ সঙ্গে পপকর্ন

www.sangbadpratidin.in, epratidin.in Printed simultaneously from Kolkata, Siliguri & Barjora

ফি হপ্তার সত্যি কথন

গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি

সমরেশ মজুমদার

আমার বইয়ের ওড়িয়া ভাষার অনুবাদক যুগলকিশোরজির বয়স চুরাশি। টেলিফোনে কথা হত। একদিন বললেন, "আপনি অচ্যুত সামন্তের কথা শুনেছেন?"

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "না। কে তিনি?"

যুগলকিশোরজি আফসোস করেছিলেন, "কি দেশে আমরা বাস করি। কলকাতা আর ভুবনেশ্বর কত কাছাকাছি অথচ এখানকার খবর আপনাদের কাছে পৌঁছয় না। অচ্যুত সামন্তকে আমরা কী চোখে দেখি তা এখানে না এলে বুঝতে পারবেন না। আপনি তো কাদম্বিনী পত্রিকার অনুষ্ঠানে আসছেন, তখন জানতে পারবেন।"

ভুবনেশ্বরে গিয়ে গেস্টহাউসের বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "ভাই, অচ্যুৎ সামন্তকে তুমি জানো?"

লোকটা অবাক হয়ে তাকাল, "কী বলছেন সাহেব। স্যরকে জানে না এমন লোক কি ভুবনেশ্বরে আছে? "

ভদ্রলোক রাজনৈতিক নেতা নন, হলে খবরের কাগজে নাম দেখতাম। যে ছেলেটি আমাকে এসকর্ট করবে তার নাম প্রদীপ পাণ্ডা। তাকে অচ্যুৎ সামন্তর কথা বলতেই সে হেসে বলল, "চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।"

গাড়িতে উঠলে প্রদীপ বলল, "উনিশশো বিরানব্বই সালে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা সম্বল করে স্যর ক্ষুধা ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমেছিলেন। এখন এই একুশ বছর পরে বিভিন্ন শাখার বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিস তৈরি করতে পেরেছেন যেখানে কুড়ি হাজার দুশো বিয়াল্লিশটি অতি গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েরা থেকে পড়াশোনা করে।"

"কিস মানে কী?"

"কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্স।" প্রদীপ বলল, "আর 'কিট' হল কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি। প্রায় একুশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে পঁচিশ রকমের প্রফেশন্যাল কোর্সে। পঁচিশ কিলোমিটার জায়গাজুড়ে কুড়িটি ক্যাম্পাসে ওদের ক্লাস হয়।"

ভাবলাম এই অচ্যুৎ সামন্ত নিশ্চয়ই অতিশয় ধনী ব্যক্তি। জিজ্ঞাসা করলাম, "কিসের ছাত্র-ছাত্রীদের কী রকম বেতন দিতে হয়?"

প্রদীপ হাসল, "একটা পয়সাও নয়। কিন্ডার গার্টেন থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাস পর্যন্ত একদম ফ্রি-তে পড়ে ওরা। দেশের অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছেলেমেয়েদের এই সুযোগ দিয়েছেন স্যর। বেশিরভাগই আদিবাসী পরিবারের ছেলেমেয়ে।"

গাড়ি প্রথমে গেল কিস-এর ক্যাম্পাসে। গাড়ি থেকে নেমে বাঁধানো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দু'পাশের সুন্দর শিক্ষাসদনগুলো দেখে মুগ্ধ হলাম। বাঁক ঘুরতেই দেখলাম জনা কুড়ি ছেলে-মেয়ে লম্বা ঝাঁটা নিয়ে রাস্তার ধুলো পরিষ্কার করছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "এরা কারা?"

অচ্যুৎ সামন্ত

"ছাত্র-ছাত্রী। এক একটা ব্যাচের উপর এক একটা অংশ পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দেখুন, স্যরও ওদের সঙ্গে আছেন।"

এটি মধ্যবয়সি মানুষকে দেখতে পেলাম ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করছেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "উনি অচ্যুৎ সামন্ত?"

"হ্যাঁ।"

আমরা দাঁড়ালাম। রাস্তা পরিষ্কার করে অচ্যুৎ সামন্ত এগিয়ে এসে নমস্কার জানালে প্রদীপ আমার পরিচয় দিল। ভদ্রলোক খুব আন্তরিক স্বরে বললেন, "আপনি এসেছেন বলে আমি খুব খুশি হয়েছি।"

দেখেই বোঝা যায় পঞ্চাশের নিচে ওঁর বয়স। ফর্সা, সুদর্শন চেহারা। পরনে খুব সাধারণ জামা-প্যান্ট।

বললাম, "এই এত বড় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়েও আপনি রাস্তা পরিষ্কার করছেন? এ দেশে এটা কল্পনা করা যায় না।"

"কিন্তু এটাও একটা কাজ। এই সময় আমি ফাঁকা ছিলাম বলে ওদের কাজে হাত মেলালাম। যে রাস্তায় দু'বেলা হাঁটছি সেটাকে ঠিক রাখা আমাদের কর্তব্য।" অচ্যুৎ সামন্ত বললেন, "চলুন।"

বলতে চাইছিলেন না প্রথমে, শেষপর্যন্ত একটু একটু করে যা জানলাম তা বিস্ময়ের অতীত। অচ্যুতের বাবা, একজন টাটা স্টিলের কর্মী। উনিশশো সত্তর সালে আচমকা মারা যান। সাত ছেলে-মেয়েকে নিয়ে অচ্যুতের মা বাধ্য হন ওড়িশার কালারাবান্ধ গ্রামে ফিরে যেতে। তখন অচ্যুতের বয়স চার কি পাঁচ। ছয় বছর বয়সেই অচ্যুৎকে চাষের খেতে কাজ করা থেকে শুরু করে নারকেল এবং কলা গাছ থেকে পেড়ে বিক্রি করতে হত বেঁচে থাকার জন্য। অচ্যুৎ ম্লান হেসে বললেন, "তখন দিনে একবেলার খাবার রোজ পেতাম না। মা নদী থেকে গেঁড়ি-গুগলি নিয়ে এসে আমাদের খাওয়াতেন। তার পর দাদা যখন জামশেদপুরে টাটা কোম্পানিতে কাজ পেলেন তখন অবস্থা সামান্য ভাল হল। কিন্তু আমি পড়তে খুব ভালবাসতাম। বাড়িতে আলো নেই বলে মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে গিয়ে পড়তাম। এইভাবে এমএসসি পাস করলাম কেমিস্ট্রি নিয়ে। তার পর দশ বছর লেকচারারের চাকরি করলাম। দেখুন, ওই ভয়ঙ্কর অভাব আমার কাছে ঈশ্বরের দান বলে মনে হয়। এই যে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি তার কারণ আমার শিক্ষা আছে। আমি লড়াই করেছি শিক্ষার জন্য। আজ সেটাই দরিদ্র বাচ্চাদের দিতে চাই।

সামন্ত বিয়ে করেননি। কারণ বিয়ে করলে পরিবারকে সময় দিতে হবে। এখন যে কুড়ি ঘণ্টা প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করেন তা করতে পারতেন না। এত বড় শিক্ষা সাম্রাজ্যের মালিক হয়েও তিনি বেতন নেন অতি সামান্য। তাঁর অনেক কর্মচারীর চেয়েও কম। কিস-এর বাইরে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তার ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের টাকায় এখনও তাঁকে জমি কিনতে হয় কারণ আরও বড় করতে চান কিটকে। রাজনীতিকে ঢুকতে দেননি তিনি। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর কোনও ইউনিয়ন নেই। কিন্তু আছে চাকরির নিরাপত্তা। যারা হাতের কাজ শেখে, ছবি আঁকে, শিক্ষাশেষে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করা হয়। আর এই কারণে দেশের বিখ্যাত অধ্যাপকদের নিয়ে এসেছেন অচ্যুৎ সামন্ত।

প্রায় তরুণ এই মানুষটির সামনে দাঁড়ালে শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হয়ে আসে। প্রতিদিন ভোরে এবং রাতে শুতে যাওয়ার সময়ে মাকে প্রণাম না করার কথা এই মানুষটি ভাবতে পারেন না। কারণ মা শিখিয়েছিলেন, "অভাবকে হারাও, পড়াশোনা করো।" অচ্যুৎ সামন্তর কাছে তাঁর মা-ই ঈশ্বর।